সে-যুগের বাঙ্গালী
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

ষষ্ঠ সংস্করণ

মূল্য আট আনা

এ, মুখাৰ্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা

> "আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
> গাহিছে আশার গীতি , পূর্ণ কর আশ ;—
> বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
> বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস !"
>
> —চিত্তরঞ্জন দাশ

সূচীপত্র

Printed by P. C. Ray at the Sri Gouranga Press Ltd., 5, Chintamani Das Lane, Calcutta-9, and Published by A. R. Mukherjee, 2, College Square, Calcutta - 12.

ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসে কি শৌর্য্যে-বীর্য্যে, কি বিদ্যাবুদ্ধিতে অথবা ধর্ম্মমত-প্রচারে, সর্ব্ববিষয়েই বাঙ্গালী একদিন অগ্রণী ছিল। বাঙ্গালীর জ্ঞানে, বীরত্বে ও ঐকান্তিক ঈশ্বরভক্তিতে একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ মুগ্ধ বিস্ময়ে বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া ছিল এবং বাঙ্গালীর যশোগান করিয়াছিল। বাঙ্গালীর সে গৌরব কোনদিন ম্লান হইবার নহে—বাঙ্গালীর যশঃ চিরদিনই অম্লান রহিয়াছে। সেই উজ্জ্বল অতীতের কয়েকজন মাত্র বাঙ্গালী বীর ও মনীষীর পরিচয় সহজ সরল ভাষায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইল। এই গ্রন্থে যে কয়টি জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নীরস জীবনী নহে—গল্পচ্ছলে বাঙ্গালার মহাপুরুষগণের জীবনের সত্য ঘটনাগুলি অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে। বালকবালিকাগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতীত যুগের কয়েকজন বাঙ্গালীর কীর্ত্তির সহিত পরিচিত হইয়া আনন্দ লাভ করিলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমাই বলিলেন—তোমরা আমায় লেখাপড়া শেখাও না। কোথায় বসা উচিত, আর কোথায় বসা উচিত নয় তা আমি বুঝিব কেমন করিয়া ?

[পৃষ্ঠা ২৭]

মহাপন্ডিত শীলভদ্র

সেকালে মগধে একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তাহার নাম নালন্দা। পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে তাহার স্থান বাহির হইয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এখানকার ধ্বংসচিহ্ন দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কত সুন্দর, কত বৃহৎ ছিল। এই জায়গা হইতে কত পাথরের আর ধাতুর মূর্ত্তি, কত চমৎকার চমৎকার মন্দির যে আবিষ্কার করা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নালন্দা ছিল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। তাই এখানে প্রধানতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ানো হইত। তবে হিন্দুদের বেদ, উপনিষদ প্রভৃতিও এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানে অনেক অধ্যাপক ছিলেন। সে যুগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

যশ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের নানা জায়গার ছাত্রেরা ত ঐ স্থানে গিয়া পড়িতই, তা ছাড়া বিদেশী বহু ছাত্র এখানে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত।

এক সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার। এখানকার ছাত্রদের বুদ্ধি ছিল প্রখর। তাহারা সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ হইত। এখানে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়ার রীতি ছিল বড় সুন্দর। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। দেশের যিনি যখন রাজা থাকিতেন, তিনি তখন ছাত্রদের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। পড়িবার জন্য, বা ঐ জায়গায় থাকিবার জন্য ছাত্রদিগকে কোন দক্ষিণা দিতে হইত না। এখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল জ্ঞানের আলোচনাই হইত। নানা দূরদেশ হইতে বড় বড় পণ্ডিতেরা এখানে আসিতেন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য।

নালন্দার বাড়ীঘর সমস্তই ইট আর পাথরে তৈয়ারী ছিল। এখানে সুন্দর সুন্দর মন্দির ছিল। মন্দিরগুলির মধ্যে সোনা আর মণি-মুক্তার কারুকার্য্য করা ছিল—এমন কথাও শুনা যায়।

নালন্দার প্রাকৃতিক শোভাও ছিল অতিশয় মনোরম। চারিদিকে মন্দির, স্তূপ, পাঠাগার, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের গৃহ, বড় বড় দীঘি আর সরোবর। সরোবরের স্বচ্ছ জলে শত শত শতদল ফুটিয়া চারিদিক আলো করিয়া থাকিত।

নালন্দার শিক্ষার অনেক বিশেষত্ব ছিল। এখানে ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির দিকে যেমন মনোযোগ দেওয়া হইত, তেমনি তাহাদের শারীরিক উন্নতির জন্যও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। কেমন করিয়া পুঁথিশালা রক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া পুঁথির যত্ন লইতে হয়, ছাত্রেরা এখানে সে শিক্ষাও লাভ করিত। প্রতিদিন ভোরবেলা ঘণ্টা বাজিত। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আর ছাত্রেরা স্নান করিতে যাইত। স্নানের পরে তাহারা শিক্ষাগৃহে যাইয়া বিবিধ বিষয় পাঠ করিত। সারাদিন তাহাদের এমনি পড়াশুনায় কাটিত। তারপর সন্ধ্যায় তাহারা ছাত্রাবাসে ফিরিত। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ছাত্রাবাসে এক একটি ঘর থাকিত। ঐ ঘরে তাহারা বাস করিত ও পড়াশুনা করিত।

তখন ভারতবর্ষে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল। সেই সময়ে এই বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন ধর্ম্মপাল। ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির যশ তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সবাই জানিত ইঁহার মত পণ্ডিত খুব কমই আছেন। ধর্ম্মপালের পাণ্ডিত্যের যশ শুনিয়া দক্ষিণ-ভারত হইতে এক পণ্ডিত গিয়া উপস্থিত হইলেন মগধের রাজার কাছে। বলিলেন, "বিদ্যাবুদ্ধিতে ধর্ম্মপালের যশ শুনিয়া আমি আসিয়াছি। আমি আপনাদের ধর্ম্মপালের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিব। তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। দেখিব তিনি কত বড় বিদ্বান।

তিনি যদি আমাকে শাস্ত্রের বিচারে এবং তর্কে হারাইতে পারেন তবেই বুঝিব তিনি সত্যসত্যই পণ্ডিত।”

রাজায় রাজায় যেমন যুদ্ধ হয়, সেকালে তেমনি পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ হইত। যুদ্ধটা হইত হাতিয়ার লইয়া নয়, শাস্ত্র লইয়া তর্ক এবং বিচারে। যে পণ্ডিত তর্কে এবং বিচারবুদ্ধিতে অপর পক্ষের পণ্ডিতকে হারাইতে পারিতেন, তিনিই জয়ী হইতেন।

সুতরাং দক্ষিণ-দেশীয় পণ্ডিত যখন “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া ধর্ম্মপালকে আহ্বান করিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিতেই হইবে। নহিলে অপমান স্বীকার করিতে হয়। তাই, মগধ-রাজ সেই পণ্ডিতকে বলিলেন অপেক্ষা করিতে। তারপর ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

ধর্ম্মপাল রাজনগরীতে যাইবার জোগাড় করিতে লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিষ্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে ছুটিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছাত্র—সে ছিল বিদ্যাবুদ্ধিতে সকল ছাত্রের সেরা, ধর্ম্মপালের প্রিয়তম শিষ্য সে—সে গিয়া ধর্ম্মপালকে বলিল, “গুরুদেব! আপনি কেন যাইবেন? আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি। আগে সেই পণ্ডিত আপনার ছাত্রদের পরাজিত করুন, তবে ত তিনি আমাদের গুরুদেবের সহিত বিচার করিবার অধিকার পাইবেন।” ধর্ম্মপাল তাঁহার প্রিয় শিষ্যটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, এক

অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন যে, এই শিষ্যটি সেই পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতে পারিবে। ধর্ম্মপাল অনুমতি দিলেন। শিষ্যটি রাজনগরীতে গিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল।

রাজসভা লোকে লোকারণ্য। রাজা সিংহাসনে। তাঁহার ডানদিকে সেই দক্ষিণ-দেশীয় পণ্ডিত। তাঁহার সম্মুখে একটি শূন্য আসন। উহা ধর্ম্মপালের জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মপালের বদলে তাঁহার সেই প্রিয় শিষ্যটি রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সেই আসনে বসিল। অমনি সেই পণ্ডিত হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে!" যাহা হউক, বিচার এবং তর্ক আরম্ভ হইল। সকলে উৎসুক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধর্ম্মপালের এই তরুণ শিষ্যটি ঐ অহঙ্কারী পণ্ডিতটিকে তর্কে হারাইয়া দিলেন। পণ্ডিতটি ধর্ম্মপালের শিষ্যটির যুক্তি না পারিলেন খণ্ডন করিতে, না পারিলেন শিষ্যটির প্রশ্নের উত্তর দিতে। তিনি হারিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে ছাত্রটি সেদিন তাঁহার গুরুর মুখ রাখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইঁহার নাম ছিল শীলভদ্র। ইনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য আর শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া মগধের রাজসভায় ধন্য ধন্য রব উঠিল। রাজা তাঁহার জ্ঞানে মোহিত হইয়া তাঁহাকে একটি নগর

দান করিলেন। কিন্তু পণ্ডিত শীলভদ্র বলিলেন, "মহারাজ! আমি যখন সন্ন্যাসী হইয়াছি, তখন আমার অর্থ-সম্পদের কি প্রয়োজন?" রাজা কিন্তু কিছুতেই ছাড়িলেন না। তখন শীলভদ্র রাজার অনুরোধে নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং নগরের রাজস্ব হইতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য একটি প্রকাণ্ড গৃহ তৈয়ারী করাইয়া দিলেন। তারপর তিনি ঘোষণা করিলেন, "আমার এই নগরের আয় দিয়া সন্ন্যাসীদের সমস্ত খরচপত্র চলিবে।"

বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্রের যেমন ছিল বিদ্যাবুদ্ধি তেমনি ছিল তাঁহার মহানুভবতা আর ত্যাগ।

যশের মুকুট পরিয়া বাঙ্গালীর ছেলে শীলভদ্র মগধ হইতে নালন্দায় ফিরিলেন। তাঁহার গুরু ধর্ম্মপাল তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

শীলভদ্র ছিলেন সমতটের এক রাজার ছেলে। বাঙ্গালা-দেশের দক্ষিণের যে অংশ বঙ্গোপসাগরের তীরে, সে যুগে উহারই নাম ছিল সমতট। প্রথমে শীলভদ্র নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যায় তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। সেই সময়েই জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষার জন্যই ইনি সমস্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে নালন্দায় গিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ

বৎসর। নালন্দায় তখন ধর্ম্মপাল সর্ব্বময় কর্ত্তা। শীলভদ্র ধর্ম্মপালের শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই গুরুর চেয়েও জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই ধর্ম্মপালের পরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এই বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র।

শীলভদ্র যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভারতের বাহিরের লোকেরাও জানিত। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া দেশ-বিদেশের কত শত পণ্ডিত যে নালন্দায় আসিতেন তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা আসিয়া শীলভদ্রের কাছে শিক্ষালাভ করিতেন। বড় বড় রাজা, এমন কি ভারত-সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত শীলভদ্রের নামে তটস্থ হইতেন। পাণ্ডিত্যের জন্য শীলভদ্র এমনি সম্মানিত হইয়াছিলেন।

শীলভদ্রের জ্ঞানের কথা শুনিয়া সুদূর চীন দেশ হইতে সেই সময়ে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। ইঁহার নাম য়ুয়াং চুয়াং। চীনদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে য়ুয়াং চুয়াং সেরা ছিলেন।

য়ুয়াং চুয়াং যখন নালন্দায় যান তখন নালন্দার শত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। কেহ ছাতা ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা তাঁহার প্রশংসা-গান গাহিয়া চীন দেশের এই অতিথিকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর তাঁহাদের সহিত য়ুয়াং চুয়াং গেলেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকটে। অধ্যক্ষ শীলভদ্র তখন বেদীতে বসিয়া ছিলেন। য়ুয়াং চুয়াং বেদীর সামনে গিয়া বিনীতভাবে শীলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। তখন হইতে তিনি শীলভদ্রের শিষ্য হইলেন। তাহার পরে প্রায় পাঁচ বৎসর নালন্দায় থাকিয়া য়ুয়াং চুয়াং শীলভদ্রের কাছে অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ শিখিবার জন্য য়ুয়াং চুয়াং ভারতবর্ষে আসেন। কিন্তু তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী তিনি শিখিয়া যান এই ভারতবর্ষ হইতে। যাঁহার কাছে তিনি এত শিখিয়াছিলেন তিনি এই বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র। জগতের একজন সেরা পণ্ডিত য়ুয়াং চুয়াং। তিনি বাঙ্গালার ছেলে শীলভদ্রের কাছে অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে।

য়ুয়াং চুয়াং তাঁহার গুরু শীলভদ্রকে ভক্তি করিতেন দেবতার মত। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমার যে সকল সংশয় কিছুতেই দূর হয় নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের বড় বড় বৌদ্ধ পণ্ডিত বহু চেষ্টা করিয়াও আমার যে সকল সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছেন।"

শীলভদ্র বৌদ্ধ ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি হিন্দু শাস্ত্রেও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দুদের আদি গ্রন্থ যে বেদ তাহা তিনি য়ুয়াং চুয়াংকে বেশ ভাল করিয়া পড়াইয়া দিয়াছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণেও তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। উহাও তিনি পড়াইতেন। তিনি বহু বিষয় জানিতেন। বহু পুস্তকও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অতি সরল। শীলভদ্রের মত বহু বিষয়ে পণ্ডিত এমন আর কোন লোক ভারতবর্ষে জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালা দেশ এজন্য গর্ব্ব করিতে পারে।

ভারত বিজয়ী বাঙ্গালী বীর — ধর্ম্মপাল
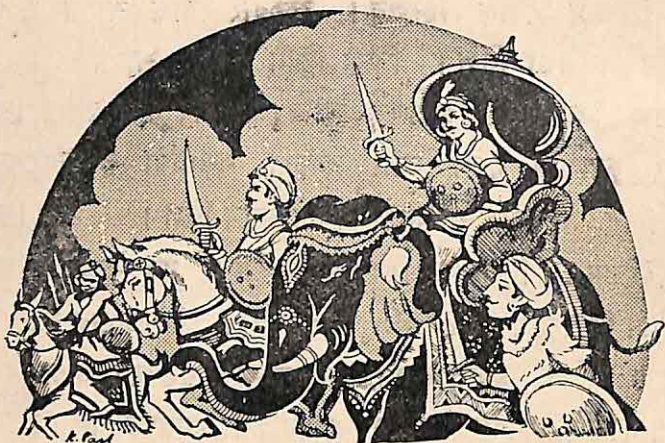
উত্তর ভারতে কান্যকুব্জ নামে দেশ। সেই দেশের সিংহাসন লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছে। ভাই দুইটির নাম ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ। ইন্দ্রায়ুধের ক্ষমতা ছিল চক্রায়ুধের চেয়ে বেশী। তাই তিনি জোর করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। চক্রায়ুধ রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কাহার কাছে তিনি সাহায্য চাহিবেন? সমস্ত ভারতবর্ষে তখন রাজায় রাজায় রেষারেষি—সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা। ছোট ছোট অসংখ্য রাজ্য তখন ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক রাজা নিজের রাজ্য লইয়াই ব্যস্ত। এমন

কোন প্রবলপ্রতাপ রাজা ভারতে তখন ছিলেন না যিনি চক্রায়ুধকে সাহায্য করিতে পারেন। এমনি সময়ে চক্রায়ুধের মনে পড়িল বাঙ্গালার কথা, আর এক বাঙ্গালী বীরপুরুষের কথা। বাঙ্গালারই এক বীর সন্তান তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব, বীরত্ব আর ক্ষমতার কথা তখন সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নাম সম্রাট্ ধর্ম্মপাল। তিনি তখন শুধু বাঙ্গালার নয়—বিহার প্রদেশেরও অধিপতি।

ভারতের সর্ব্বত্র যখন বিশৃঙ্খলা—সর্ব্বত্রই যখন একতার অভাব, তখন এই ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে বাঙ্গালায় একতা ছিল, আর সেই মিলিত-বাঙ্গালার বাঙ্গালী-রাজার বিক্রমে সমস্ত ভারত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা তখন সোনার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালী রাজার সুশাসন, ঐশ্বর্য্য আর বিক্রম ভারতবর্ষের সকল রাজার হিংসার কারণ হইয়াছে। ধর্ম্মপালের মত মহাবীর সম্রাট্ ভারতে তখন আর কেহ ছিলেন না। তাই চক্রায়ুধ মহাবীর ধর্ম্মপালের কাছে আশ্রয় চাহিলেন।

চক্রায়ুধ আসিয়া ধর্ম্মপালের অধীনতা স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "সম্রাট্! আমার পিতার রাজ্য আমাকে ফিরাইয়া দিন। আমি আপনার অধীন রাজারূপে এই রাজ্য শাসন

করিব।” ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধের আবেদন শুনিলেন। ভাবিলেন, বাঙ্গালার শক্তি-সামর্থ্য সমস্ত ভারতে প্রচার করিতে হইবে—বাঙ্গালার বাহিরে রাজ্যবিস্তার করিয়া বাঙ্গালীর বীরত্ব আর গৌরব ঘোষণা করিতে হইবে। রাজ্যজয়ের আশায় ধর্ম্মপালের বীর-হৃদয় নাচিয়া উঠিল। বাঙ্গালার বীরত্ব-গৌরব ঘোষণা করিবার জন্য তিনি চক্রায়ুধের সহিত উত্তর ভারতে কান্যকুব্জের দিকে যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মপালের মনে তখন অসীম আনন্দ। বাঙ্গালী সৈন্যগণও নববলে বলীয়ান্ হইয়া মহা আনন্দে ধর্ম্মপালের সহিত চলিল। বাঙ্গালী মহাবীর ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয়ের এই সূত্রপাত।

পথে যাইতে যাইতে দুইটি রাজ্য পড়িল—কাশী আর প্রয়াগ। বিহারের পশ্চিমে কাশী প্রদেশ, আর গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রয়াগ। ধর্ম্মপাল তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ঐ দুইটি রাজ্য অনায়াসে জয় করিলেন। বিজয়োল্লাসে বাঙ্গালী বীরগণ মাতিয়া উঠিল, ধর্ম্মপালের দেহে ও মনে যেন নূতন শক্তির সঞ্চার হইল।

ওদিকে ধর্ম্মপালের কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হওয়ার খবরটা ইন্দ্রায়ুধের কাছে পৌঁছিতে দেরী হইল না। ইন্দ্রায়ুধ প্রমাদ গণিলেন। ভয় পাইয়া তিনি উত্তর ভারতের অনেক রাজার সাহায্য চাহিলেন। ফলে উত্তর ভারতের প্রায় সব বলশালী রাজা আসিয়া ইন্দ্রায়ুধের সহিত যোগ দিলেন।

ধর্ম্মপাল সব শুনিলেন। কিন্তু তিনি দমিলেন না। সিংহের মত যাইয়া তিনি কান্যকুব্জ রাজ্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভয়ানক যুদ্ধ হইল। কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের কাছে কোনও নরপতি সেদিন আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইন্দ্রায়ুধ পরাজিত হইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ধর্ম্মপালের ক্ষমতা ও বীরত্ব দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তারপর মহাসমারোহে কান্যকুব্জের সিংহাসনে নবীন সম্রাট্ ধর্ম্মপালের অভিষেক হইল। ঐ অভিষেক উৎসবে ভারতের নানান্ দেশের রাজারা উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মপালকে কান্যকুব্জের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। বৈতালিকগণ সুমধুর গান গাহিয়া ধর্ম্মপালের বীরত্ব ও যশোগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

কিন্তু ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধের কথা ভোলেন নাই। তাঁহার অভিষেকের পরমুহূর্ত্তেই তিনি চক্রায়ুধকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া ঘোষণা করিলেন, "আমার হইয়া চক্রায়ুধই কান্যকুব্জ রাজ্য আজ হইতে শাসন করিবেন।" যে-সব রাজারা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা ধর্ম্মপালের মহত্ত্ব দেখিয়া "সাধু সাধু!" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজ্য পাইয়াও আশ্রিতকে এই রকম করিয়া একটা রাজ্য দান করা কম কথা নয়। ধর্ম্মপাল শুধু বীর ছিলেন না। তিনি কত উদার, কত মহৎ ছিলেন, ইহার দ্বারা তাহাও প্রমাণ হইতেছে।

চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জ দান করিয়া, উত্তর ভারতে বাঙ্গালীর বীরত্বগৌরব প্রচার করিয়া, জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ধর্ম্মপাল বাঙ্গালার দিকে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে রাজপুতানার ভিল্লমাল নামক জায়গায় এক তেজস্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল নাগভট। ধর্ম্মপালের এই গৌরব নাগভটের সহ্য হইল না। বাঙ্গালার রাজা সমস্ত উত্তর ভারতের সম্রাট্ হইতে চলিয়াছেন, ইহা নাগভটের মনঃপূত হইল না। সুতরাং তিনি প্রকাণ্ড এক সৈন্যবাহিনী লইয়া কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া লইলেন। চক্রায়ুধ হারিয়া গিয়া আবার ধর্ম্মপালের আশ্রয় চাহিলেন। এইবার নাগভটের সহিত নবীন সম্রাট্ ধর্ম্মপালের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ধর্ম্মপালের শ্বশুর ছিলেন তৃতীয় গোবিন্দ। ইনি দাক্ষিণাত্যের রাজা ছিলেন। তাঁহার কাছে কিন্তু ইতিমধ্যেই খবর পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার জামাতা ধর্ম্মপাল নাগভটের আক্রমণে বিপন্ন। সংবাদ শুনিয়া গোবিন্দ রাগে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। এই গোবিন্দেরই পিতা ধ্রুব, নাগভটের পিতা বৎসরাজকে একবার এমন হারাইয়া দিয়াছিলেন যে, বৎসরাজ মরুভূমিতে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই বৎসরাজের পুত্র নাগভট কিনা আজ গোবিন্দের জামাতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহস করে! নাগভটকে আচ্ছা করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য গোবিন্দ বহু সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া ধর্ম্মপালকে

সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। নাগভট তখন মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে ধর্ম্মপালের সৈন্য, পিছনে তৃতীয় গোবিন্দের সৈন্য। নাগভট হারিয়া গিয়া কোথায় যে লুকাইলেন তাহার কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না।

এইবার ধর্ম্মপাল সমস্ত উত্তর ভারতের অধিপতি হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তোলে এমন শক্তিশালী সম্রাট্ কেহই আর রহিল না। চক্রায়ুধ তাঁহার অধীন রাজা হইয়া কান্যকুব্জ শাসন করিতে লাগিলেন। উত্তর ভারতের অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যগুলি তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইল। সমস্ত উত্তর ভারতে বিশাল রাজ্য গঠন করিবার যে আশা ধর্ম্মপাল করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল।

ধর্ম্মপাল বহুকাল ধরিয়া উত্তর ভারতের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ও বিহারে সকল বিষয়েই অপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল। প্রজাদিগকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাহাদের সুখ-শান্তি যাহাতে বাড়ে সেদিকে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তিনি সকলের মঙ্গল করিয়া সকলের কাছেই এমন প্রিয় হইয়াছিলেন যে, গ্রামে গ্রামে নরনারীরা এবং গৃহে গৃহে খেলার সময়ে শিশুরা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ধর্ম্মপালের প্রশংসাগান করিত। শুনিয়া শুনিয়া খাঁচার পোষা শুকপাখারাও ঐ প্রশংসাগান শিখিয়া গিয়াছিল। উহারাও ঐ প্রশংসা আওড়াইত।

ধর্ম্মপালের প্রতাপ ছিল অসীম। তাঁহার সৈন্যগণ যখন যুদ্ধে যাইত তখন তাহাদের পায়ের ধূলা উড়িত এমন যে, তাহাতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া যাইত। তাঁহার রণহস্তীর নাম ছিল 'ঘনাঘন'। সে যখন যুদ্ধে যাইত, তখন লোকের মনে হইত যেন ঝড়ের মেঘ সাজিয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের এক পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য একটি প্রকাণ্ড বিহার বা আবাস নির্ম্মাণ করেন। এই বিহারের নাম ছিল "বিক্রম-শিলা মহাবিহার"। দেখিতে দেখিতে এই বিহার বিদ্যাশিক্ষার স্থান হইয়া উঠিয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। শত শত পণ্ডিত এখানে বিদ্যাদান করিতেন, আর শত শত ছাত্র এখানে বিদ্যাশিক্ষা করিত।

ধর্ম্মপাল ধর্ম্মে বৌদ্ধ হইলেও তিনি সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিতেন, "যাহার যাহা ধর্ম্ম সে তাহা আচরণ করুক।" এমন উদারতা খুব কম রাজারই দেখা গিয়াছে।

ধর্ম্মপালের সময়ে শিক্ষার যেমন উন্নতি হইয়াছিল, শিল্পেরও তেমনি উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গালার শিল্প তখন জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিল। ঐ সময়ে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি বাঙ্গালী শিল্পিগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে-সকল মূর্ত্তি দেখিলে আজও মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয় বাঙ্গালীর সৌন্দর্য্যবোধ সেকালে কি

চমৎকারই না ছিল! বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর কল্পনাশক্তি তখন কতই না উন্নত ছিল! ধর্ম্মপালের সময়ে ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীতপাল নামে দুইজন সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন। ইঁহারা পিতাপুত্রে পাথর খুদিয়া এবং বিবিধ ধাতু মিশাইয়া গলাইয়া এমন চমৎকার মূর্ত্তি গড়িতেন যে, তাহা দেখিয়া লোকে অবাক হইত।

শিল্পে, শিক্ষায় ও বীরত্বে বাঙ্গালীর যশ সে যুগে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালীর এই উন্নতি ও যশের মূলে ছিল ধর্ম্মপালের সাধনা। ধর্ম্মপাল বাঙ্গালী জাতিকে মনের মত করিয়া গড়িয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির গৌরব ও প্রভাব যে ভাবে বাড়াইয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাস চিরসমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

জননায়ক

দিব্বোক ও ভীম

বাঙ্গালাদেশে যুগে যুগে অসাধারণ বীর জন্মিয়াছেন। আর এ দেশে কেবল যে রাজারাই বীরত্ব দেখাইয়াছেন তাহা নহে। দরকার হইলে দেশের অতি সাধারণ লোকেরাও বীরত্ব দেখাইয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছে। এক সময়ে এই সাধারণ লোকেদের মধ্যে দুই জন অসাধারণ বীরপুরুষ দেখা গিয়াছিল। তাঁহারা দুইজনেই ছিলেন কৃষক। তাঁহারা উত্তরবঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম ছিল দিব্বোক আর ভীম। দিব্বোকের ভাইয়ের ছেলে ছিল ভীম। তাঁহারা জমি চাষ করিয়া দিব্যি আরামে দিনযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু যখন দরকার পড়িল, তখন লাঙ্গল ছাড়িয়া তাঁহারা বিরাট সেনাদল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আর ঢাল-তলোয়ার বর্শা-বল্লম লইয়া বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় তখন দ্বিতীয় মহীপাল নামে এক রাজা রাজত্ব

করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজাদের সুখ-শান্তি ছিল না। তিনি প্রজাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন। রাজার উচিত মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রজার সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্য শাসন করা। কিন্তু মহীপাল তাহা করিতেন না। তিনি নিজের ইচ্ছামত শাসন করিতেন। ইহাতে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইল। সমস্ত বাঙ্গালায় অশান্তি উপস্থিত হইল। রাজার অত্যাচারে আর অবিচারে প্রজারা পীড়িত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কিসে ইহার প্রতিকার হইতে পারে?

রাজার শাসনে প্রজারা যখন এমনি অসন্তুষ্ট, তখন উত্তর-বঙ্গের ঐ দুইজন চাষী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রাজা যদি প্রজার সুখ-শান্তির দিকে না দেখেন, তবে তিনি রাজা কিসের! এই অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসন হইতে দূর করিয়া আমরা অন্য কাহাকেও সিংহাসনে বসাইব।" দিব্বোক আর ভীমের কথাটা বাঙ্গালার জনসাধারণের মনে লাগিল। তাহারা দলে দলে ঢাল-তলোয়ার লইয়া দিব্বোক আর ভীমের চারিদিকে আসিয়া জুটিতে লাগিল। এই দুইজন কৃষক-বীর হইলেন নেতা। বিশাল এক সেনাদল রাজার সহিত যুদ্ধের জন্য সাজিয়া উঠিল।

ওদিকে রাজা মহীপাল দেখিলেন ভীষণ বিপদ—তাঁহার রাজ্য যাইতে বসিয়াছে। তিনি তখন দিব্বোক আর ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। হাজার হাজার সৈন্য। কেহ বা

হাতীর পিঠে, কেহ ঘোড়ার পিঠে, কেহ বা রথে, কেহ বা হাঁটিয়া চলিল দিব্বোক আর ভীমের সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করিতে।

এইবার দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। কৃষক-বীর দিব্বোক আর ভীমের অসাধারণ বীরত্বে বাঙ্গালার রাজা মহীপালের সেনাদল হারিয়া গেল। মহীপাল যুদ্ধেই মারা গেলেন। ফলে সমস্ত রাজ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল। কৃষক-বীর দুইজনের বিজয়ধ্বনিতে বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। দিব্বোক সমস্ত উত্তর-বঙ্গ অধিকার করিলেন। মহা জাঁকজমকের সহিত দিব্বোকের অভিষেক-উৎসব হইয়া গেল। দিব্বোক স্বাধীনভাবে উত্তর-বঙ্গ শাসন করিতে লাগিলেন। প্রজাদের তিনি বড় ভালবাসিতেন। প্রজারা তাঁহার অধীনে সুখে শান্তিতে বাস করিত। তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম। তাই ক্রমে ক্রমে তাঁহার রাজ্যের সীমা বাড়িতে লাগিল। মহীপালকে পরাজিত করিয়া দিব্বোক এক মস্ত জয়স্তম্ভ তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গের একটি প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে ঐ জয়স্তম্ভ আজও রহিয়াছে। এই স্মৃতিচিহ্নটি আজও এই কৃষক-বীরের সমরনিপুণতা আর অসাধারণ বাহুবলের পরিচয় দিতেছে।

দিব্বোক বেশীদিন বাঁচেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাইয়ের ছেলে ভীম উত্তর-বঙ্গের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তখন ভীমকে আবার এক ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

মহীপালের এক ভাই ছিলেন। তাঁহার নাম রামপাল। মহীপালের মৃত্যুর পর রামপাল দেখিলেন যে উত্তর-বাঙ্গালার সিংহাসন একজন কৃষক অধিকার করিল। ইহা তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি ভীমকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া উত্তর-বঙ্গ অধিকার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে দিব্বোকের মত ভীমও অসাধারণ বীরপুরুষ—অসীম তাঁহার সাহস ও শক্তি, তখন তিনি খানিকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন।

রামপাল তাঁহার ভাই মহীপালের মত অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি প্রজাদিগকে বড় ভালবাসিতেন, তাই প্রজারাও তাঁহাকে ভালবাসিত। স্থতরাং তিনি ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া ঠিক করায় দলে দলে প্রজারা আসিয়া তাঁহার সৈন্যদলে যোগ দিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এক বিশাল সৈন্যদল গড়িয়া উঠিল।

এই বিশাল সৈন্যদল গেল উত্তর-বঙ্গে ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে। একটির পর একটি করিয়া কয়েকখানি গ্রাম তাহারা অনায়াসে জয় করিল। রামপালের সৈন্যদের কেহ কোনরকম বাধা দিল না। কৃষক-বীর ভীম কিন্তু চুপ করিয়া ছিলেন না। তিনি তৈয়ারী হইয়াই ছিলেন। কিছুদূর বিনা বাধায় অগ্রসর হইতেই ভীম তাঁহার সৈন্যদল লইয়া বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িলেন রামপালের সৈন্যদের উপর। ইহাতে

রামপালের সৈন্যরা ভীমের সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া বাঁচিল।

রামপাল প্রমাদ গণিলেন। ভাবিলেন, "অসামান্য বীর এই ভীম। কেবল আমার রাজ্যের সৈন্য লইয়া উহাকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না।" তাই তিনি দেশবিদেশের রাজাদের সাহায্য চাহিলেন। মগধ, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, মানভূম কত জায়গা হইতে রাজারা আসিলেন রামপালের সাহায্য করিতে। এইবার মস্ত এক সৈন্যদল লইয়া রামপাল নিজে গেলেন ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে।

ভীমও তৈয়ারী ছিলেন যুদ্ধের জন্য। শত্রুরা যাহাতে সহজে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে না পারে, সেজন্য তিনি তাঁহার রাজ্যের সীমানা দিয়া একটি প্রকাণ্ড পাঁচিল গঠন করিলেন। আজও উহা আছে। উহা "ভীমের জাঙ্গাল" নামে বিখ্যাত।

যাহা হউক, ভীম রামপালকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না, বা দমিলেন না। তিনি ভীষণভাবে রামপালকে বাধা দিলেন। একদিকে ভীমের সৈন্যদল, অপর দিকে চার পাঁচটি রাজার মিলিত সৈন্যদল। ভীমের সৈন্যদলের চেয়ে রামপালের সৈন্যদল দশগুণ বেশী। তবুও ভীমের সৈন্যদলের চাপে রামপালের সৈন্যরা মাঝে মাঝে পিছনে হঠিয়া যাইতে লাগিল। ভীম নিজে তাঁহার সৈন্যদলকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কখনও বা তিনি নিজেই শত শত শত্রু-

সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে ভীমের বীরত্ব দেখিয়া শত্রুদলও অবাক হইয়া গেল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভীম সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ তাঁহার হাতীর উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে রামপালের সৈন্যেরা চারিদিক হইতে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাতীটিকে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর তাহারা হাতীর পিঠ হইতে অজ্ঞান ভীমকে লইয়া তাহাদের তাঁবুতে চলিয়া গেল। জ্ঞান হইলে পর ভীম দেখিলেন তিনি শত্রুর হাতে বন্দী হইয়াছেন। ভীমের একজন অতিশয় প্রিয় সেনাপতি ছিল। তাহার নাম ছিল হরি, সে-ও ছিল কৃষক, আর খুব বীর! ভীম বন্দী হওয়ার পরে এই হরি খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ভীম বন্দী হওয়ায় সৈন্যদল হইয়াছিল ছত্রভঙ্গ। তাই রামপালের সৈন্যদলের সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা হারিয়া গেল। হরিও শত্রুর হাতে বন্দী হইল।

রামপাল জয়ী হইয়া সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিলেন। তাঁহার আদেশে ভীম আর হরিকে মারিয়া ফেলা হইল। কত শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কৃষক বীরপুরুষ দুইটির অসাধারণ বীরত্বের কথা বাঙ্গালী ভোলে নাই, কোনদিন ভুলিবেও না।

ভক্ত চৈতন্যদেব

"বাঙ্গালীর হিয়া
অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া !"

নবদ্বীপ। পাশ দিয়া ভাগীরথী নদী তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কত লোক নদীতে স্নান করিতেছে—কেহ বা কোশা-কুশী আর ফুল লইয়া নদীতীরে মাটির শিব গড়িয়া শিব-পূজা করিতেছে। কিন্তু এই জায়গায় যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন তাঁহারা একজন বালকের দুরন্তপনায় অস্থির হইয়া উঠিতেন। সে রোজ নানারকম দুষ্টামি করিত। লোকেরা যখন তাহাদের শুকনা কাপড় গঙ্গাতীরে রাখিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে নামিত, তখন ছেলেটি তাহাদের কাপড়, চাদর ইত্যাদি জলে ভিজাইয়া দিয়া লুকাইয়া পলাইয়া যাইত। কেহ টের পাইত না। কখনও বা কাহারও কাহারও কাপড় লুকাইয়া

রাখিয়া সে গোপনে সরিয়া পড়িত। লোকেরা স্নান করিয়া উঠিয়া তাহাদের কাপড় না পাইয়া রাগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিত। কোন ব্রাহ্মণ হাতে-গড়া মাটির শিব সাম্‌নে রাখিয়া হয়ত চোখ বুজিয়া পূজা করিতেছে; কোথা হইতে ঐ দুরন্ত ছেলে আসিয়া চুপিচুপি তাহার শিবমূর্ত্তি আর কোশা-কুশী লইয়া দিল দৌড়। চোখ মেলিয়া শিবমূর্ত্তি আর কোশা-কুশী না দেখিয়া ব্রাহ্মণদের চক্ষুস্থির হইয়া যাইত! সে কাহারও গায়ের চাদর টানিয়া লইয়া পলাইত, কাহারও পূজার ফুল ফেলিয়া দিত। শুধু কি তাই? যে-সব মেয়েরা নদীতে স্নান করিতে যাইতেন তাঁহাদের এলোচুলে ছেলেটি ওকৃড়া ফলের বীচি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিত। ওকৃড়া ফলের বীচিতে বেজায় কাঁটা আর শুঁয়া। উহা চুলে পড়িলেই চুলের সহিত জড়াইয়া যাইত। আর ছাড়াইতে গিয়া মেয়েদের বেশ কয়েকগাছি চুল ছিঁড়িয়া যাইত। রাগে তাঁহারা গর্ গর্ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেন। মাঝে মাঝে ছেলেটি ধরা পড়িত। তখন কাঁদিয়া-কাটিয়া সকলের হাতে-পায়ে ধরিয়া সে ক্ষমা চাহিত আর বলিত, "এবার আমায় ছাড়িয়া দাও। আর কখনও আমি এমন কাজ করিব না।" কিন্তু ছাড়া পাইয়া আবার পরদিন ঠিক আগের মতই সে দুরন্তপনা করিত।

নিজের বাড়ীতে আর পাড়াতেও তাহার দুষ্টামির অন্ত ছিল না। সকাল-সন্ধ্যায় সে কেবল এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাইত, আর

লুকাইয়া কারও ঘরের দুধ, কারও ঘরের ভাত খাইত। যাহার ঘরে কিছু পাইত না, তাহার ভাতের হাঁড়ি সে ভাঙ্গিয়া রাখিয়া আসিত। কোনও ঘরে ছোট শিশু ঘুমাইতে থাকিলে সে তাহাকে জাগাইয়া দিয়া পলাইয়া যাইত। কাহারও বাগানের পাকা কলা চুরি করিত। আর নিজের বাড়ীতে, ঘর একটু খালি পাইলেই সে অমনি ঘরের জিনিষপত্র ছড়াইয়া ফেলিত। তারপর কাহারও পায়ের শব্দ শুনিলেই তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়া দিব্যি ভাল মানুষটির মত চোখ বুজিয়া ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিত। বাড়ীতে সবাই ভাবিত, ঘরের জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করিল কে ? এ সকল যে ঐ দুষ্টু ছেলেটির কাণ্ড, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। ভাবিত, হয়ত উহা ভূত-প্রেতের উৎপাত। তাই ঘরে ঘরে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হইত।

এই যে দুরন্ত বালক, ইঁহার নাম চৈতন্যদেব। এই দুরন্ত ছেলেই একদিন মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র হইয়াছিল মহৎ—তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন অতিশয় বিনয়ী আর দয়ার অবতার। ইঁহার ঈশ্বর-ভক্তি ছিল বড় গভীর। ভগবানের অপার মহিমা আর অসীম করুণা ইনি নিজে বুঝিয়াছিলেন, আর তাহা প্রচার করিবার জন্য ইনি দেশের নানা জায়গায় ঘুরিয়াছিলেন। শুধু বাঙ্গালায় নয়, ভারতের নানা প্রদেশে—পল্লীতে পল্লীতে, হাটে-মাঠে-বাটে, দীনহীনের মধ্যে দীনহীনের বেশে তিনি সকলের কাছে ভগবানের জয়গান করিয়া

বেড়াইয়াছিলেন। যে তাঁহাকে দেখিত সে-ই মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার বশীভূত হইত, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত। এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্বাস যে ইনি স্বয়ং ভগবান ছিলেন।

চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রিতে। তাঁহার আর একটি নাম বিশ্বম্ভর। তাঁহার আরও নাম ছিল—গোরাচাঁদ, নিমাই, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি। ইনি দেখিতে ছিলেন বড় সুশ্রী, বর্ণ ছিল গৌর। মনে হইত যেন চাঁদের কিরণ তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে ঝলমল করিতেছে।

চৈতন্যদেবের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। আর মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলায়। সেকালে বিদ্যাশিক্ষার স্থান হিসাবে নবদ্বীপ খুব বিখ্যাত ছিল। তাই জগন্নাথ বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। পরে আর তিনি শ্রীহট্টে ফিরেন নাই। নবদ্বীপেই তিনি ঘরবাড়ী করিয়া বসবাস করেন।

চৈতন্যদেবের এক বড় ভাই ছিলেন। তাঁহার নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপকে জগন্নাথ ও শচীদেবী বড় ভালবাসিতেন। ইনি দেখিতে যেমন সুশ্রী, তেমনি ছিলেন বিদ্বান্ আর বুদ্ধিমান্। তিনি একবার যাহা পড়িতেন, তাহাই তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত। ষোল বৎসর বয়সেই ইনি একজন মস্ত পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারে ইঁহার অনুরাগ ছিল না। তাই একদিন কাহাকেও না জানাইয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বাড়ী

ছাড়িয়া চলিয়া যান। চৈতন্যদেব তখন পাঁচ বৎসরের বালক। বিশ্বরূপ চলিয়া যাওয়াতে বাপ মায়ের খুব কষ্ট হইল। বাপ-মায়ের কষ্ট দেখিয়া এইবার চৈতন্যদেবের দুরন্তপনা কমিল। তিনি দিনরাত বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। চৈতন্যদেবের পড়াশোনায় অত ঝোঁক দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পড়াশোনা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার ভয়, এক ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এই ছেলেও না আবার লেখাপড়া শিখিয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়।

পড়াশোনা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে চৈতন্যের হইল দারুণ কষ্ট। তিনি একদিন আঁস্তাকুড়ে ভাঙ্গা হাঁড়ী আর ছাইয়ের গাদায় বসিয়া রহিলেন। শচীমাতা তাঁহাকে উঠিয়া আসিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি উঠেন না। খবরটা গ্রামে রটিয়া গেল, পাড়া-প্রতিবেশীরা আসিয়া জুটিল। সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ নিমাই! তুমি ওখানে বসিয়া কেন?" তিনি বলিলেন, "তোমরা আমায় লেখাপড়া শেখাও না। কোথায় বসা উচিত আর কোথায় বসা উচিত নয়, তা আমি বুঝিব কেমন করিয়া? লেখাপড়া শিখিলে তবে ত আমার জ্ঞান হইবে!" ছেলের কথা শুনিয়া নিমাইয়ের পিতামাতা তাঁহাদের ভুল বুঝিলেন। পাড়া-প্রতিবেশীরাও জগন্নাথ ও শচীদেবীকে বলিলেন, "ছেলেকে পড়িতে পাঠাও।" শচীমাতা আর জগন্নাথ ছেলেকে

পড়িতে পাঠাইবেন বলিয়া রাজি হইলেন। নিমাই তখন সেই আঁস্তাকুড় হইতে উঠিয়া আসিলেন।

নিমাইয়ের পৈতা হইল। তারপর তিনি পড়িবার জন্য টোলে ভর্ত্তি হইলেন। অতি অল্পবয়সেই তিনি সকল বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এমনই স্মরণ-শক্তি ছিল যে, একবার তিনি যাহা শুনিতেন তাহা তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত। দুপুরে তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতেন। সঙ্গে যাইত সহপাঠীরা। ঐ সময়ে টোলের ছাত্রদের মধ্যে নানা শ্লোক লইয়া নানারকম তর্ক-বিতর্ক হইত। কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে কেহই তর্কে আর যুক্তিতে পারিয়া উঠিত না।

একবার তাঁহারই সহপাঠী রঘুনাথ নামে এক তরুণ যুবক ন্যায়শাস্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। নিমাই শুনিয়া রঘুনাথকে বলিলেন, "ভাই, আমি ত টোলো গুরুর কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়ি নাই। তবে তোমাদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমি একখানি টীকা লিখিয়াছি। দেখ ত টীকাটি কেমন হইয়াছে!" তারপর নিমাই তাঁহার সহপাঠী রঘুনাথকে তাঁহার লেখা টীকা পড়িয়া শুনাইলেন। রঘুনাথ টীকা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন— ঝর্ ঝর্ করিয়া তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। উহা দেখিয়া অবাক হইয়া নিমাই বলিলেন, "ভাই, তুমি কাঁদিতেছ কেন?" রঘুনাথ উত্তর দিলেন, "ভাই, তোমার এই টীকা এত ভাল হইয়াছে যে, আমার টীকা কেহ পড়িবে না,

তাই কাঁদিতেছি।” নিমাই তখনই তাঁহার টীকাখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সহপাঠীদের তিনি এমনি ভালবাসিতেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল বটে, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার তাঁহার ছিল না।

নিজের শিক্ষা সমাপন করিয়া এবং বিবাহ করিয়া চৈতন্যদেব একটি টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে তাঁহার টোলে ছাত্র আসিয়া জুটিল। চৈতন্যদেব তখন মস্ত পণ্ডিত, দেশজোড়া তাঁহার নাম।

এমনি সময়ে কেশব-কাশ্মীরী নামে কাশ্মীরবাসী এক অসাধারণ পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিলেন, আর “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া সেখানকার পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। চৈতন্যদেব তর্কযুদ্ধে বড় বড় পণ্ডিতদিগকে হারাইয়া দিতেন। সুতরাং নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা কেশব-কাশ্মীরীকে ইঁহারই কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

চৈতন্যদেব তখন গঙ্গার ধারে তাঁহার ছাত্রদের লইয়া নানান্‌ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। কেশব-কাশ্মীরী ঐ জায়গায় গিয়া চৈতন্যদেবকে বলিলেন, “শুনিলাম তুমি নাকি মস্ত বড় পণ্ডিত! আমার সঙ্গে কিছু তর্ক-বিতর্ক কর। আমি তোমার বিদ্যার যাচাই করিব। ভারতের কোনও পণ্ডিত আমার সহিত তর্ক করিতে সাহস করে নাই। বিদ্যায় সবাই

আমার কাছে হার মানিয়াছে। এখন এই নবদ্বীপে জিতিতে পারিলেই আমি 'ভারতবিজয়ী' পণ্ডিত হইব।"

চৈতন্যদেব প্রথমে তর্কযুদ্ধ করিতে রাজী হন নাই। কিন্তু কেশব-কাশ্মীরীর পীড়াপীড়িতে আর নবদ্বীপের সুনাম বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন,—"আচ্ছা, আপনি এই গঙ্গা নদীর মহিমা বর্ণনা করিয়া আমাদের শোনান।" কেশব-কাশ্মীরী একশত শ্লোকে গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিলেন। চৈতন্যদেব তখন তাঁহার স্তবের মধ্য হইতে অনেক ভুল দেখাইয়া দিলেন।

ইহাতে কেশব-কাশ্মীরীর মাথা হেঁট হইল। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী বৃদ্ধ পণ্ডিত। বাঙ্গালী তরুণ যুবক চৈতন্যদেবের কাছে হারিয়া তিনি বড় লজ্জা পাইয়া সেদিন পলাইয়া গেলেন। পরে ইনি নাকি চৈতন্যদেবেরই শিষ্য হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

এই সময়ে চৈতন্যদেবের পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া একবার বাঙ্গালার সমস্ত জায়গায় জ্ঞান বিতরণের জন্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে যখন নবদ্বীপে ফিরিলেন, তখন শুনিলেন, যে সাপের কামড়ে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী মারা গিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পরে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে আর একটি বালিকার সহিত চৈতন্যদেবের বিবাহ হইয়াছিল।

কিছুদিন মাতা, নবপরিণীতা পত্নী ও ছাত্রদের লইয়া তাঁহার দিনগুলি বড় সুখেই কাটিল। কিন্তু দেশের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে দেশের লোকেরা ধর্ম্ম-কর্ম্মের নামে কেহবা ছাগ-মহিষ বলি দেয়, ঘটা করিয়া শুধু পূজাই করে, কিন্তু ভগবানের কথা কেহ ভুলিয়াও ভাবে না, অথবা কেহই তাঁহাকে ভক্তিভরে ডাকে না। হিন্দু-সমাজের আরও কয়েকটি জিনিস তাঁহাকে বড় দুঃখ দিল। তিনি দেখিলেন সমাজের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোকেরা নীচ জাতির লোকদের বড় ঘৃণা করেন। চৈতন্যদেব ঠিক করিলেন সমাজের এই দোষ দূর করিতে হইবে—ভগবানের কথা ভাবিতে হইবে এবং দেশের লোককে শিখাইতে হইবে ভগবানকে ভক্তিভরে ডাকিতে।

এই সময়ে তিনি একবার গয়ায় গেলেন পিতার পিণ্ডদান করিতে। পথে ঈশ্বরপুরী নামে এক মহাভক্তের সহিত তাঁহার দেখা হইল। চৈতন্যদেবের মনে তখন ধর্ম্মভাব জাগিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি ধর্ম্মের কথা লইয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিতেন। এই ঈশ্বরপুরীর লেখা ভগবানের স্তোত্রের মধ্য হইতে কতদিন তিনি ভুল বাহির করিতেন। কিন্তু এবার ঈশ্বরপুরীর গভীর ভক্তি দেখিয়া চৈতন্যদেবের মতিগতি ফিরিয়া গেল। তিনি ঈশ্বরপুরীর শিষ্য হইলেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে ভক্তি শিখাইলেন। কৃষ্ণভক্তিতে

চৈতন্যদেবের মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিল। তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন সকলে তাঁহাকে অহঙ্কারী পণ্ডিত বলিয়া জানিত—তিনি কেবলই লোকের শ্লোক-রচনায় অথবা স্তব-রচনায় ভুল দেখাইয়া উপহাস করিতেন। সেই চৈতন্যদেব নবদ্বীপে ফিরিয়া হরিনামে একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা আর ভক্তিতে তিনি পাগলের মত হইলেন—শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়া সদাই তিনি অশ্রুপাত করেন, আর তাঁহার নাম কীর্ত্তন করেন। মাঝে মাঝে তাঁহার ভাবাবেশ হয়—তখন বাহিরের জ্ঞান আর থাকে না। মনে ভাবেন, ভগবানের সহিত তিনি এক হইয়া গিয়াছেন। কি গভীর ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা।

চৈতন্যদেবের এমনি পরিবর্ত্তন দেখিয়া সবাই অবাক্ হইয়া গেল। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার কাছে পড়িতে গেলে তিনি আর পড়ান না—কেবল ভগবানের গুণগান করেন। গুরুদেবের এই ভাব দেখিয়া কোন ছাত্র টোল ছাড়িল, কোন ছাত্র বা তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহারই সহিত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। চৈতন্যদেবের টোল উঠিয়া গেল। ভগবানের নাম-গান করাই তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধনা হইয়া উঠিল।

চৈতন্যদেবের ঈশ্বর-ভক্তিতে সবাই মোহিত হইল। নবদ্বীপের অনেক পণ্ডিত আর ঈশ্বর-ভক্ত তাঁহার শিষ্য হইলেন।

ক্রমে অন্যান্য জায়গা হইতেও বহু ঈশ্বর-ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সবাই মিলিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেবের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীবাস। তাঁহারই উঠানে কীর্ত্তন হইত। এক একদিন সারা রাত্রি সেখানে খোল করতাল বাজিত—সেই বাজনায় আর মধুর হরিনামে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিত। গান গাহিতে গাহিতে চৈতন্যদেব সেখানে নাচিতেন। কোথা দিয়া যে এক একদিন সমস্ত রাত কাটিয়া যাইত তাঁহারা বুঝিতেও পারিতেন না।

নবদ্বীপের একদল পণ্ডিত চৈতন্যদেবের এই হরিগুণ-গানকে বিষম উপদ্রব বলিয়া মনে করিলেন। দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের শিষ্য হইতেছিল। পাছে নদীয়ার লোকে এই পাগলটার পাল্লায় পড়িয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করে, এই ভয়ে তাঁহারা কাজীর কাছে নালিশ করিলেন। কাজী কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন।

শ্রীচৈতন্য সেই নিষেধ শুনিলেন না—দল বাঁধিয়া নগরের পথে পথে সংকীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। শত শত মৃদঙ্গ, শত শত করতাল বাজিতে লাগিল। তাঁহারা নাচিতে নাচিতে হরিনাম গাহিতে গাহিতে পথ দিয়া চলিলেন। কাজী তখন চৈতন্যদেবের অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া, আর তাঁহার ভগবানে গভীর ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনি আর কোনো

বাধা দিলেন না। চৈতন্যদেব আর তাঁহার ভক্তেরা তখন হইতে বিনা বাধায় ভগবানের মহিমা গান করিতে লাগিলেন।

হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ, সকলকেই চৈতন্যদেব ভালবাসিয়া আপন করিয়াছিলেন। তাই হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ, সবাই তাঁহার শিষ্য হইত। যবন হরিদাস নামে এক মুসলমান চৈতন্যদেবের বড় প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার আর এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম নিত্যানন্দ। এই দুইজনকে একদিন চৈতন্যদেব বলিলেন, "ঘরে ঘরে তোমরা হরিনাম প্রচার কর। জাতি ধর্ম্ম না বাছিয়া সবাইকে শিখাও ভগবানকে ভালবাসিতে।" নিত্যানন্দ আর হরিদাস হরিনাম প্রচার করিতে বাহির হইলেন।

নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুই ভাই ছিল। তাহারা বড় অনাচারী ছিল। তাহারা কোন ধর্ম্মের ধার ধারিত না। নিত্যানন্দ হরিনাম বিলাইতে বিলাইতে জগাই মাধাইকে হরিনাম দিতে গেলেন। কিন্তু তাহারা কীর্ত্তন শুনিয়া, রাগিয়া গিয়া নিত্যানন্দের কপালে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিল। ফলে তাঁহার কপাল কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া উহাদিগকে ভালবাসিয়া উহাদের সহিত কোলাকুলি করিতে গেলেন। শ্রীচৈতন্য শুনিয়া সেখানে গিয়া ঐ দুই ভাইকে উপদেশ দিলেন। ইহার ফল ফলিল। তাহাদের অনুতাপ হইল। তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিল। দুই ভাই চৈতন্যদেবের পায়ে ধরিল—নিত্যানন্দের

কাছে ক্ষমা চাহিল। জগাই মাধাই দুষ্কর্ম্ম ছাড়িয়া চৈতন্য-দেবের শিষ্য হইল—তাহারা ভাল হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের উপদেশে এমনিভাবে আরও অনেক পাপী সচ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার করিয়া চৈতন্যদেব নদীয়াকে মাতাইয়া তুলিলেন। তারপর ভাবিলেন, শুধু নবদ্বীপের মধ্যে এই মধুর নাম প্রচার করিলে ত চলিবে না। এই নাম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে। এই জন্য তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

চৈতন্যদেব যখন গৃহত্যাগ করেন তখন নিশুতি রাত। সবাই ঘুমাইতেছিল। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার আর মাতা শচীদেবীর ঘুম ভাঙিল। শচীমাতা "নিমাই, নিমাই" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রতিধ্বনি যেন বলিতে লাগিল—"নাই নাই"। সমস্ত নদীয়াবাসী জাগিয়া উঠিল। তাঁহারা পাঁতি পাঁতি করিয়া নিমাইকে খুঁজিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না। নদীয়ায় শোকের বান বহিল। সমস্ত নদীয়াবাসী শোক করিতে লাগিল।

নবদ্বীপ হইতে চৈতন্যদেব কাটোয়া নামক জায়গায় গিয়াছিলেন পায়ে হাঁটিয়াই। সেখানে গিয়া কেশব ভারতী নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে তিনি সন্ন্যাসে দীক্ষা লন। পরে তিনি পুরীধামে গমন করেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া

তিনি প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। যেখানে তিনি যাইতেন সেইখানেই কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিতেন—হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেন। তাঁহার ঈশ্বর-প্রেম দেখিয়া শত শত ভক্ত আসিয়া তাঁহার অনুচর হইত। তখন সকলে মিলিয়া হরিগুণ-গান করিতে করিতে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেন। এই সময়ে বহু বিখ্যাত সাধকের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া এই বাঙ্গালার ছেলে শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব আর নদীয়ায় ফিরেন নাই। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি ভারতের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন, আর প্রধানতঃ পুরীতেই বসবাস করিয়াছিলেন।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে পুরীধামেই শ্রীচৈতন্যদেবের অপরূপ জীবন-লীলার অবসান ঘটে।

স্বভাবকবি আলওয়াল

বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ সীমায় সমুদ্রের তীর দিয়া একখানি বড় নৌকা যাইতেছে। ডাঙ্গা অতি নিকটেই। একদিকে সমুদ্রের বেলাভূমি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—অ প র দি কে অপার অসীম নীল সমুদ্র। কেবল জল আর জল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। আকাশে প্রকটি একটি করিয়া তারা জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর তাহাদের আলো সাগর-জলে পড়িয়া ঝলমল করিয়া দুলিয়া সারা হইতেছে। নৌকার আরোহী দুইজন—পিতা ও পুত্র। আরও লোক অবশ্য আছে। তাহারা মাঝি-মাল্লা। বাহিরে সাগরের কলরোল। নৌকার দাঁড় টানার ছপ্ ছপ্ শব্দ। নৌকায় মাঝি-মাল্লারা এক-রকম নীরব। ছইয়ের ভিতর পিতাপুত্রে কি যেন কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার এক জায়গা হইতে নৌকাখানি রওনা হইয়াছে। উহা যাইবে আরাকানে। আরাকান ব্রহ্ম-দেশের একটি বিভাগ। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া নৌকাখানিকে ঐ জায়গায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ! চারিদিক হইতে আট দশখানি নৌকা আসিয়া এই আরাকান-গামী নৌকাখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল। মাঝিরা হাঁকিয়া উঠিল —ডাকাত পড়িয়াছে! ডাকাতেরা বিদেশী। উহারা পর্ত্তুগীজ জলদস্যু। যে সময়কার কথা, তখন এই পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ বাঙ্গালার দক্ষিণে নদ-নদীতে, আর বঙ্গোপসাগরের ধারে ধারে ঘুরিত ফিরিত। আর স্থবিধা পাইলেই গ্রামে নামিয়া পড়িয়া লোকেদের ধনরত্ন সব লুণ্ঠন করিয়া, নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিত। অথবা, নৌকা ইত্যাদি দেখিলে, তাহাও আক্রমণ করিয়া লোকেদের কাছে যাহা থাকিত সব কাড়িয়া লইত।

ডাকাত পড়িয়াছে শুনিয়া ছইয়ের ভিতর হইতে পিতা-পুত্রে লাঠি-সড়কি লইয়া বাহির হইলেন। মাঝিরা দাঁড় বাগাইয়া ডাকাতদের বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। অবিলম্বে ডাকাতদের সহিত ভীষণ লড়াই বাধিয়া গেল। মাঝি-মাল্লারা মরিতে লাগিল। যুবকটির পিতা ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। তখন যুবকটি বেগতিক বুঝিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পলাইলেন। ডাকাতেরা তাঁহার কোনও খোঁজ পাইল না। নৌকায় যাহা কিছু ছিল, সব তাহারা লুঠ করিয়া লইয়া

সরিয়া পড়িল। ঐ যুবক সাঁতার কাটিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া বাঁচিলেন।

এই যে যুবকটি ডাকাতদের হাত হইতে সেদিন রক্ষা পাইয়াছিলেন, ইঁহার নাম আলওয়াল। ইনি মুসলমান ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর নামক জায়গায় ইঁহার নিবাস ছিল। জালালপুরের অধিপতি ছিলেন সম্‌শের কুতুব নামে এক ব্যক্তি। আলওয়াল এই সম্‌শের কুতুবের এক মন্ত্রীর ছেলে। পিতার সহিত ইনি কোনও কাজ উপলক্ষ্যে আরাকান যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে বিপদে পড়িয়া ইনি পিতাকে হারাইলেন—তাঁহার সর্ব্বস্ব ডাকাতেরা কাড়িয়া লইল। তিনি শুধু প্রাণে বাঁচিলেন।

আলওয়াল রক্ষা পাইয়া কোন রকমে আরাকানে গিয়া পৌঁছিলেন। কোথায় যান, কি করেন, কিছুই তিনি প্রথমে ঠিক করিতে পারিলেন না। পরে ভাবিলেন, "রাজমন্ত্রীর ছেলে আমি। রাজ-দরবারে আশ্রয় হয়ত পাইলেও পাইতে পারি। ইহা ভাবিয়া তিনি গিয়া উপস্থিত হইলেন আরাকানের বৌদ্ধ রাজা শ্রী চন্দ্র সুধর্ম্মার দরবারে। সেখানে গিয়া তিনি তাঁহার পরিচয় দিলেন। আরাকানের রাজা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। আলওয়াল যেন সাগরে কূল পাইলেন।

আলওয়াল কবি ছিলেন। কবি হিসাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার স্থান খুব উচ্চে। রাজার কাছে আশ্রয়

পাইয়া কবিতা রচনা করিয়া ইনি কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আরাকানরাজ ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মুসলমান। ইঁহার নাম ছিল মাগন ঠাকুর। মুসলমান হইলেও নামটা ইঁহার হিন্দুর মত বটে। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সে-যুগে অনেক মুসলমানের এমনি হিন্দু নাম থাকিত। এই মাগন ঠাকুর কবিতা গান প্রভৃতি বড় ভালবাসিতেন। তিনি আলওয়ালের চমৎকার কবিত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। আলওয়ালকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। বিদেশ-বিভূঁয়ে মাগন ঠাকুরের ভালবাসা, আর রাজার আশ্রয় পাইয়া বড় আনন্দেই তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

আলওয়াল কেবল উঁচুদরের কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন পণ্ডিত। আরবী, ফার্‌শী, সংস্কৃত আর হিন্দী এই কয়টি ভাষাতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তাই মাগন ঠাকুর যখন দেখিলেন যে আলওয়াল শুধু কবি নহেন, তিনি পণ্ডিতও, তখন তিনি আলওয়ালকে অনুরোধ করিলেন, "আপনি হিন্দী 'পদ্মাবৎ-কাব্যে'র অনুবাদ করুন।" আলওয়াল অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। এই কাব্য শেষ করিতে তাঁহার বহুদিন লাগিয়াছিল। ইহা যখন শেষ হয় তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। একথা তিনি তাঁহার ঐ অনূদিত 'পদ্মাবৎ-

কাব্যে'র মধ্যেই বলিয়া গিয়াছেন। এই কাব্য রচনায় তিনি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য আর কবিত্ব দুই দেখাইয়া গিয়াছেন।

'পদ্মাবৎ-কাব্য' রচনার পর মাগন ঠাকুর আলওয়ালকে দুইখানি ফার্শী কাব্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে বলেন। আলওয়াল অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহা শেষ হইবার আগেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হইল। গভীর দুঃখে কবি অনুবাদ বন্ধ করিলেন।

এই সময়ে সহসা আরাকানে এক ঘোর গোলযোগ উপস্থিত হয়। বাঙ্গালার শাসনকর্তা শাহ্‌শুজা ভারত-সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের দ্বারা তাড়িত হইয়া আরাকানে যান। পরে আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। আরাকানরাজ শুজার অনুচরগুলিকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। তখন আরাকান রাজ্যে মুসলমানগণের উপর ভীষণ অত্যাচার আর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। রাজ্যে যখন এই রকম গোলযোগ তখন কয়েকজন আলওয়ালের নামে মিথ্যা করিয়া আরাকান-রাজের কাছে নালিশ করিল। রাজার কাছে আলওয়ালের সমাদর এই সকল লোকদের সহ্য হইতেছিল না। তাই তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। বলিল, আলওয়াল শাহ্‌শুজার সহিত পরামর্শ করিয়া, আরাকানরাজকে সিংহাসন হইতে তাড়াইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। আলওয়াল শাহ্‌শুজারই দলের লোক

ইত্যাদি। ফলে, নিরপরাধ কবি আলওয়াল বিনা বিচারে কারাগারে বন্দী হইলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল আলওয়াল নির্দোষ। আরাকানরাজ তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু রাজার আশ্রয় তিনি আর পাইলেন না। ইহার পর অনেক বৎসর ধরিয়া কবি আলওয়ালের বড় কষ্টেই কাটিল। দীন-দরিদ্রের মত তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এমনি সময় সৈয়দ মুসা নামে একজন সদাশয় লোক তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। ইঁহারই অনুরোধে আলওয়াল আবার সেই অসমাপ্ত ফার্‌শী কাব্যের অনুবাদে হাত দিলেন এবং অসম্পূর্ণ কাব্য দুইখানি শেষ করিলেন।

এই সময়ে কবি বেশ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। লিখিতে গেলে তাঁহার হাত কাঁপিত। দৃষ্টিও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি তখন বেশ দরিদ্র। কিন্তু কবিত্বের উৎস তাঁহার শুকাইয়া যায় নাই। তাই ঐ বৃদ্ধবয়সেও তিনি আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি এতটুকু বিচলিত না হইয়া নানাভাবে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকখানি কাব্যেরই ভাষা, ভাব ও ছন্দ মনোহর। ইঁহার কাব্যে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতুর চমৎকার বর্ণনা আছে। ইঁহার রচিত কতকগুলি ঈশ্বরস্তোত্র আছে, সেগুলিও বড় সুন্দর। পড়িলে

মনে হয়, কবি বেশ মনে-প্রাণে ঈশ্বরের মহিমা বুঝিয়াছিলেন। এই সকল কবিতার ভাষা যেমন সরল, তেমনি সুন্দর।

ইহা ছাড়া তাঁহার কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী লইয়া লিখিত। এই কবিতাগুলি তিনি তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাগুলির ভাষা আর বর্ণনাভঙ্গী বড় সুন্দর। আজিও বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব-সমাজ খুবই অনুরাগ ও ভক্তির সহিত তাঁহার এই সকল রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতাসমূহ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র কবিত্ব দেখাইয়া এই নিরাশ্রয় নিঃসম্বল কবি আরাকানরাজ ও তাঁহার মন্ত্রীকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের সম্মান সমাদর আর আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কম কথা নহে। বাঙ্গালী কবির কবিত্বে সুদূর ব্রহ্মদেশের আরাকান প্রদেশের রাজা আর মন্ত্রী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালীর গৌরব। শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যও তাঁহার দানে সমৃদ্ধ। বাঙ্গালা সাহিত্যে আলওয়ালের নাম চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকিবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।